গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৪১ সংখ্যা | ৩১ মে - ৬ জুন ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ভোটের হিসাবে গরমিল গভীর উদ্বেগের

এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ মে এক বিবৃতিতে বলেন, ১৯৫২ থেকে চলে আসা নির্বাচনী নিয়ম-কানুনকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে নির্বাচন কমিশন প্রথম পাঁচ দফা ভোটদানের পূর্ণাঙ্গ হিসাব দেয়নি। এটা গভীর উদ্বেগের বিষয়। এমনকি বহু দল ও অন্যান্য মহল এই হিসাব প্রকাশের দাবি করা সত্ত্বেও তারা ভোট পড়ার সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করার বদলে তাদের ব্যর্থতাকে ঢাকতে ভিত্তিহীন যুক্তি দিচ্ছে। প্রিসাইডিং অফিসারদের ইস্যু করা ১৭-সি ফর্মে বুথভিত্তিক ভোট পড়ার তথ্য নির্বাচন কমিশনের হেফাজতেই আছে। এই তথ্য প্রকাশ করার কাজে তাদের বাধা কোথায়?

সংশোধিত আকারে ভোট পড়ার যে চূড়ান্ত হিসাব নির্বাচন কমিশন শতাংশে প্রকাশ করছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ প্রাথমিক তথ্যের থেকে এই হার অস্বাভাবিকভাবে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি পর্যায়েই ভোটের দিনে অনেক রাত পর্যন্ত ভোট পড়ার পর নির্বাচন কমিশন ভোটদানের হার বিশ্লেষণ করে ভোট পড়ার সংখ্যা

পাঁচের পাতায় দেখুন

আদানিকে অবাধ লুঠের সুযোগ কি টেম্পো-ভর্তি টাকার বিনিময়ে, মোদিজি!

নরেন্দ্র মোদি ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে কয়লা-দুর্নীতির অভিযোগ অনেক দিনের। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রকের তদন্ত সংস্থা ডিআরআই (ডায়রেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স) ২০১৪ সালে কয়লা-দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। ২০১৬ সালে তারা জানায় যে, এই দুর্নীতিতে যাদের দিকে সন্দেহের আঙুল উঠেছে, তার মধ্যে আদানিদের সংস্থা অন্যতম। সম্প্রতি লন্ডনের প্রখ্যাত সংবাদপত্র ফিনান্সিয়াল টাইমস এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য খতিয়ে দেখে কাগজের প্রথম পাতায় আবার তুলে এনেছে সেই খবর। জানিয়েছে, ইন্দোনেশিয়া থেকে কম দামে নিম্ন মানের কয়লা আমদানি করে বিপুল দামে তামিলনাড়ুর সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন সংস্থা 'ট্যানগেডকো'-র কাছে বিক্রি করে হাজার হাজার কোটি মুনাফা লুটেছে আদানিরা। পরিণামে সরকারি রাজস্বের বিপুল ক্ষতি শুধু হয়েছে তাই নয়, চড়া দামে বিদ্যুৎ কিনে সেই দুর্নীতির বোঝা বইতে বাধ্য হতে হয়েছে দেশের

চারের পাতায় দেখুন

প্রচারে দমদম, বরানগর, উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীরা

'তোমরা না থাকলে বামপন্থী রাজনীতির কথা বলার কেউ থাকত না'

পুরুলিয়া শহরে একদা সিপিএমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা ছিলেন ভদ্রলোক। বেশ কিছুদিন তিনি আর দলীয় কাজকর্মে থাকছিলেন না। এবারের নির্বাচনে জনে জনে ডেকে বলেছেন, বামপন্থাকে চাও তো এসইউসি-কে ভোটটা দিও। ভোটের আগে প্রচারের একদম শেষ লগ্নে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র এক সংগঠক। যন্ত্রণাবিদ্ধ সেই বামপন্থী মানুষটি বললেন, যতবার তোমাদের প্রচার মিছিল আমার বাড়ির সামনে দিয়ে গেছে, আমি নিজে নিজের কানটা মুলেছি। ক্ষমতার দম্ভে তোমাদের কর্মীদের ওপর আমরা একসময় কী না করেছি!

যখন যুক্তফ্রন্ট ভাঙল (গত শতকের সাতের দশকে) ছেড়ে বেরিয়ে এল সেদিন এসইউসি-র কথায় কান দিইনি। আজ লাল ঝান্ডা ফেলে কংগ্রেসের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে সিপিএম। বলছিলেন, আমার দলের এক নেতা বোঝাতে এসেছিলেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের হাত ধরতে হয়েছে। আমি বললাম, নতুন করে কোন বিশেষ পরিস্থিতিটা তৈরি হল বোঝান। তিনি নিরুত্তর। বলেছি, নিজের বিবেককেও ঠকাচ্ছেন কেন? সৎ হলে বলুন, দুটো চারটে সিট পাওয়ার আশায় আপস করেছি। এস ইউ সি আই আজ দেশে ১৫১টা সিটে লড়বার হিম্মত রাখে। ওরা একটা সিটেও যদি না জেতে, তবু মাথা উঁচু করে লাল ঝান্ডাটা তুলে রাখার গর্বে পথ চলবে। আর আপনারা কী করবেন? বামপন্থী কর্মীদের হত্যাকারী কংগ্রেসের দয়ায় খুদকুঁড়োর মতো একটা দুটো সিট যদি ভাগ্যে থাকে তাই নিয়ে আনন্দ করবেন! এসইউসিআই(সি) সংগঠককে তিনি পরম স্নেহে বলেছেন, তোমাদের ভোট যদি এক শতাংশও বাড়ে, জানবে দেশে বামপন্থী রাজনীতির শক্তি বাড়লো। তোমরা না থাকলে বামপন্থী রাজনীতিই এ বারের ভোটে অনুপস্থিত থাকত।

পুরুলিয়া শহরেরই আর এক প্রবীণ সিপিএম কর্মীকে হাত চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য বোঝাতে গিয়েছিলেন দলেরই এক শিক্ষক কর্মী। তিনি গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, যে দরিদ্র পরিবার থেকে তুমি উঠে এসেছ তাদের সাথে কংগ্রেস নেতাদের আচরণ ভুলে গেলে? বামপন্থী রাজনীতি করে পড়াশুনা করেছো, এখন শিক্ষক হয়েছো কিন্তু বামপন্থী আদর্শটা বোঝারই চেষ্টা করোনি। নেতারাও বোঝাননি। আজ তাই পার্টির এই বামপন্থা বিরোধী স্ট্যান্ড যে কত ক্ষতিকর বুঝতেও পারছ না। বললেন, আমি কমিউনিস্টদেরই ভোট দেব, তাই আমার ভোট টর্চলাইটেই পড়বে। পরিবারের বাকিদেরও বলেছি, এটাই সঠিক বামপন্থী পার্টি, তারাও যেন ভেবে দেখে।

রেমাল দুর্গতদের পাশে

এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য গুরুত্ব সহকারে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের সর্বস্তরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচার স্থগিত রেখে দলের কর্মীরা এবং বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা বিপর্যস্ত এলাকায় গিয়েছেন এবং তাদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। ঝড় আসার আগেই ২৪ মে রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সরকারকে চিঠি দিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়েছে। বারবার হওয়া এই বিপর্যয় থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় স্থায়ী নদীবাঁধ নির্মাণের দাবিতে 'নদীবাঁধ বাঁচাও কমিটি' গঠন করে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে। অথচ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

২৬ মে থেকে ঝড়বৃষ্টিতে বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নদী-সমুদ্র উপকূলবর্তী গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, কুলতলী, জয়নগর-২, রায়দিঘি, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, সাগর, কাকদ্বীপ, কুলপি, ডায়মন্ডহারবার ও বজবজ-১ ও ২ ব্লক সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় নদীবাঁধ যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় তীরবর্তী জনসাধারণ আশঙ্কিত। উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ, টাকি সহ পুরো এলাকায় একই অবস্থা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকারও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নোনা জল ঢুকে চাষের জমির ক্ষতি

আটের পাতায় দেখুন

সমালোচনার মুখ বন্ধ করতেই

সংবাদমাধ্যমের উপর হামলা

ইউএপিএ আইনে প্রায় সাত মাস জেলবন্দি থাকার পর সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ছাড়া পেলেন নিউজক্লিক সংবাদ সংস্থার প্রধান সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, তাঁকে দিল্লি পুলিশ যে ভাবে গ্রেফতার করেছিল তা শুধু আইন মেনে হয়নি তাই নয়, গোটা প্রক্রিয়াটির মধ্যেই আইনকে ধোঁকা দেওয়ার একটা পরিকল্পিত চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। প্রবীরবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল— বিদেশের টাকায় ভারত বিরোধী প্রচার চালানো, গোষ্ঠীসংঘর্ষকে মদত দেওয়া— যার কোনওটির পক্ষেই পুলিশ উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারেনি।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে, তা হলে পুলিশ তড়িঘড়ি ওই সাংবাদিককে গ্রেফতার করে একেবারে ইউএপিএ-র মতো একটা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কঠোর আইন জুড়ে দিল কেন? এমনকি তাঁকে যে গ্রেফতার করা হচ্ছে, তা লিখিত ভাবে তাঁকে জানানোর নিয়মও লঙ্ঘন করা হল কেন? এ প্রশ্নও উঠছে যে, এ কি শুধুই পুলিশের কীর্তি? এতখানি ঔদ্ধত্য কি শুধু পুলিশের হতে পারে যে, একটি সংবাদমাধ্যমের অফিসে এবং তার সাংবাদিক ও কর্মীদের বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে তাঁদের মোবাইল, ল্যাপটপ ও অন্যান্য নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করছে তারা? ইউএপিএ আইনে জেলে ভরছে তাঁদের? নাকি এটি আরও বড় পরিকল্পনার অঙ্গ? দিল্লি পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অঙ্গুলিহেলন ছাড়া এমন কাজ কি সম্ভব?

শুধু তো নিউজক্লিকই নয়, গোটা সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে বিজেপি সরকারের মনোভাব আজ কারও অজানা নয়। মোদি শাসনে সরকারের কাজের সমালোচনা মানে রাষ্ট্রবিরোধিতা। শুধু সরকারের বা মন্ত্রীদের সমালোচনা নয়, এমনকি মোদি ঘনিষ্ঠ ধনকুবেরদের অবাধ লুঠপাটের সমালোচনা করলেও একই রকম ভাবে তা দেশদ্রোহিতা হিসাবে গণ্য করা হয়। হয় তাকে সরকারপন্থী 'গোদি মিডিয়া' হতে হবে, না হলে সরকারি হামলার মুখোমুখি হতে হবে, রাষ্ট্রদ্রোহী তকমা দিয়ে জেলে ভরে দেওয়া হবে। এর উদাহরণ তো কম নয়।

কিন্তু গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে পরিচিত সংবাদমাধ্যমের উপর মোদি সরকার এত খড়্গহস্ত কেন? কোনও একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কতখানি মুক্ত ও অবাধ তা বিচার হয় সেখানে সংবাদমাধ্যম কতখানি স্বাধীন তা দিয়ে। রাষ্ট্র এবং সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা যা ঘটছে তা জনসাধারণকে অবগত রাখাই স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের কাজ এবং গণতন্ত্রের পক্ষেও তা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তা হলে যে বুর্জোয়ারা একদিন সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেই বুর্জোয়াদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসেবে মোদি সরকার কেন আজ তার কণ্ঠরোধ করছে? কেন আজ ইডি, সিবিআই, পুলিশ বারে বারে হানা দিচ্ছে একের পর এক সংবাদমাধ্যমের দফতরে?

এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের স্তর অতিক্রম করে অন্তিম স্তরে পৌঁছনোর ইতিহাসটি। পুঁজিবাদ তার বিকাশের স্তর অতিক্রম করে সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে তার সমস্ত প্রগতিশীল ভূমিকা হারিয়ে আজ প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করেছে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সমস্ত রকম সামাজিক অগ্রগতির পথে সে আজ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র আজ একচেটিয়া পুঁজির লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থপূরণই রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ। অবাধ গণতন্ত্র এ কাজে প্রধান বাধা। তাই আজ সে গণতন্ত্রকে দুপায়ে মাড়াচ্ছে। মুক্ত সংবাদমাধ্যমের উপর আক্রমণ মুমূর্ষু পুঁজিবাদের সেই প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রেরই অংশ।

পুঁজিবাদ আজ স্বাধীন কিংবা বিরোধী কোনও রকম মতপ্রকাশেরই বিরোধী। স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীন সাংবাদিকতা আজ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আক্রমণের সম্মুখীন। স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের উপর নিত্যনতুন আইন এবং নিষেধাজ্ঞা এমন করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে কোনও সাংবাদিক বা সংবাদমাধ্যম সরকারের কোনও কাজের সমালোচনা করতে না পারে। পাশাপাশি শাসক একচেটিয়া পুঁজিমালিকরা অর্থের জোরে প্রধান প্রধান সংবাদমাধ্যমগুলি কিনে নিয়ে সেগুলিকে নিজেদের দাসানুদাসে পরিণত করছে এবং নির্মম পুঁজিবাদী শোষণকে আড়াল করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে— যারা পুঁজিবাদী সমস্ত রকম শোষণ-লুণ্ঠন এবং সরকারের সমস্ত রকমের জনবিরোধী কুকর্মকে আড়াল করে জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয়গুলিকেই মানুষের সামনে বড় করে তুলে ধরছে। এগুলিই এখন 'গোদি মিডিয়া' তথা সরকারের তাঁবেদার সংবাদমাধ্যম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই ভাবে পুঁজির আধিপত্য সংবাদমাধ্যমের একটি বড় অংশকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। তাই মোদি শাসনে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের জায়গা হয়েছে ১৬১তে। গত বছর যা ছিল ১৫০।

গত দশ বছরের মোদি শাসনের ব্যর্থতা সমাজ জুড়ে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষার ভয়াবহ ব্যয়বৃদ্ধি, বেকারত্ব নিয়ে মানুষের তীব্র ক্ষোভ বাকি সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। রামমন্দির নিয়ে বিজেপি নেতারা যেমনটি ভেবেছিলেন, এই দিয়েই তাঁরা আসমুদ্রহিমাচল হিন্দুদের মন জয় করে নেবেন, যে জন্য প্রধানমন্ত্রী অসমাপ্ত মন্দিরেই উদ্বোধন করে দিলেন, বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি। কারণ মানুষের জীবনের ভয়ঙ্কর আর্থিক সঙ্কট এই সব ভাবাবেগকে ম্লান করে দিয়েছে। ক্ষুব্ধ মানুষের সামনে বিজেপি নেতাদের দিশেহারা দশা।

এই অবস্থায় একটি স্বৈরাচারী সরকারের সামনে আর একটি রাস্তাই খোলা থাকে। তা হল, গায়ের জোরে সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দেওয়া। দেশে এখনও যে অজস্র সংবেদনশীল মানুষ, চিন্তাশীল গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা রয়েছেন, তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে সমালোচনাগুলি প্রকাশ পাচ্ছে, সেগুলি যাতে আরও বড় হয়ে দেখা না দেয়, সেই জন্য সব স্বৈরশাসকের মতো বিজেপির কাছে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করাটা খুবই জরুরি। আজ সরকারের নীতির বিরোধিতাকে— যে নীতির একমাত্র লক্ষ্য দেশের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা, দেশবিরোধিতা হিসাবে দাগিয়ে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা তাদের অন্যতম কৌশল হয়ে উঠেছে। এর আসল লক্ষ্য, সব ধরনের সমালোচককে ভয় দেখানো, সমঝে দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া যে, সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুললে দুর্গতি আছে। দেখো কী করতে পারি। সরকারের বিরুদ্ধে বললেই ইউএপিএ দিয়ে লাইফ হেল করে দেব। জেলে পচতে হবে। অর্থাৎ সারা দেশে এমন একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করো যাতে যে কেউ সরকারের সমালোচনা করতে ভয় পায়। অত্যন্ত আশার কথা, মোদি সরকারের এই স্বৈরশাসন সকলেই মুখ বুজে মেনে নেয়নি। শ্রমিক, কৃষক সহ জনসাধারণের মধ্যেও যেমন এই শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাড়ছে, তেমনই বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বিচারপতি, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক সহ সমাজের শিক্ষিত অংশের মধ্যেও এই স্বৈরশাসনের বিরোধিতা বাড়ছে। তারই প্রতিফলন যেমন দেখা যাচ্ছে, জাতীয় শিক্ষানীতির দেশজোড়া বিরোধিতায় শিক্ষক অধ্যাপক শিক্ষাবিদদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদে তেমনই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধেও সাংবাদিক সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠী এর তীব্র বিরোধিতায় সোচ্চার।

বিচারপতিদের একটি অংশ এখনও যে মোদি সরকারের জো-হুজুরে পরিণত হয়নি, একের পর এক রায়ে তা স্পষ্ট হচ্ছে। নিউজ ক্লিক সম্পাদকের মুক্তি যেমন তারই প্রতিফলন, তেমনই বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তির বিরুদ্ধে রায়েও তা স্পষ্ট হয়েছিল। বাস্তবিক মুমূর্ষু পুঁজিবাদের স্বৈরাচারী রূপের বিরুদ্ধে এই সচেতন সাহসী বিরোধিতাই ভরসা। সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের সামনে উদারবাদী বুদ্ধিজীবী সহ শিক্ষিত সচেতন অংশের এই প্রতিবাদ একটা কার্যকরী বাধা।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদের সূতি-২ লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য জনপ্রিয় শিক্ষক কমরেড বিমলকৃষ্ণ দাস মোটর নিউরো ডিজিজে আক্রান্ত হয়ে ১৬ মে বহরমপুরের এক নার্সিংহোমে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৮৭-৮৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর দাবিতে গড়ে ওঠা শিক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট শিক্ষক

নেতা প্রয়াত বিজয় কুমার দাসের সাহচর্যে কমরেড বিমল ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র সাথে যুক্ত হন। পরবর্তী কালে দলের কাজ শুরু করেন। ১৯৯০ সালে ডিএন কলেজের সংসদ নির্বাচনে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। পরে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসে এলাকায় গৃহশিক্ষক হিসাবে জীবিকা নির্বাহের কাজ শুরু করেন এবং এর মধ্য দিয়েই ছাত্র সংগঠন ও দলের কর্মী গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, যা এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার এবং সব স্তরের ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যাওয়ার গুণে এলাকায় জনপ্রিয় শিক্ষক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে রবীন্দ্র-নজরুল, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম বসুদের মতো মনীষীদের স্মরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূতি থানা জুড়ে সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। পরে স্থানীয় মুরালিপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পার্শ্বশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তিনিই প্রথম স্কুলে মনীষী চর্চা শুরু করেন। ফলে ব্যাপক অংশের শিক্ষক ছাত্র অভিভাবকদের মধ্যে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ নিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং এলাকায় বহু ছাত্রছাত্রীকে সংগঠনের কর্মী সংগঠক সমর্থকে পরিণত করেন। বর্তমানে সূতি ইউনিটে দলের ছাত্র-যুব কর্মীদের সিংহভাগই তাঁর ছাত্র। তিনি বহু দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পড়িয়েছেন, পড়াশোনার অন্যান্য খরচখরচাও জোগাড় করে দিয়েছেন। এলাকার নানা দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনেও তিনি নিয়মিত ভূমিকা পালন করেছেন। সাধারণ জনমানসে এর প্রভাব পড়ে। এ জন্য তাঁকে শাসক দলের রোষানলে পড়তে হয়েছিল এবং মিথ্যা মামলায় হয়রান হতেও হয়েছিল। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় সূতি থানার অন্তর্গত এক এলাকায় ঈদের অনুষ্ঠানে কমরেড বিমলকৃষ্ণ দাসের অংশগ্রহণ এবং মঞ্চে বক্তব্য রাখা ছিল প্রতি বছরের নির্দিষ্ট কর্মসূচি।

কমরেড বিমলকৃষ্ণ দাসের মরদেহ তাঁর বাসভবনে এলে এলাকার সহস্রাধিক ছাত্র-যুব-অভিভাবক তাঁকে শেষ দেখার জন্য ভিড় করেন। তাঁদের চোখের জলে বিদায় নিলেন অকাল প্রয়াত এই জনপ্রিয় শিক্ষক সংগঠক। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য ও সূতি-২ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড সামিরউদ্দিন, জেলা কমিটির সদস্য ও সূতি-১ সাংগঠনিক লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অনুপ সিংহ, শিক্ষক নেতা কমরেড রতন কুমার রায়, এলাকার প্রবীণ শ্রমিক নেতা কমরেড শিশির কুমার সিংহ, মুর্শিদাবাদ জেলা পার্টি অফিসের পক্ষে কমরেড অরূপ কুমার দাস, প্রয়াত কমরেডের স্ত্রী অলি চৌধুরী সহ বহু কর্মী ও সাধারণ মানুষ। তাঁর বাসভবন থেকে মরদেহ নিয়ে শতাধিক কমরেড ও বহু সাধারণ মানুষ শেষকৃত্যে সামিল হন।

তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন বিশিষ্ট সংগঠককে এবং সাধারণ মানুষ হারালেন তাঁদের আপনজনকে।

কমরেড বিমলকৃষ্ণ দাস লাল সেলাম

আলোচনা ছাড়াই বিল পাশে রেকর্ড মোদি-সংসদে

ট্র্যাডিশন বদলের আশা কই

৪ জুনই জানা যাবে কারা আগামী পাঁচটা বছর লোকসভা আলো করে বসে থাকবেন। প্রশ্নটা হল নতুন লোকসভাও কি বিগত লোকসভার মতো বিনা আলোচনায় বিল পাশের রেকর্ডের ট্র্যাডিশন চালিয়ে যাবে? বদলের বিশেষ কোনও আশা কি মানুষের আছে?

২০১৪-তে সংসদ ভবনকে গণতন্ত্রের মন্দির বলে তার সিঁড়িতে নরেন্দ্র মোদির সাষ্টাঙ্গ প্রণামের দৃশ্যটা মনে পড়ে? তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদিতে ১০টা বছর কাটিয়ে ফেলেছেন। নতুন সংসদভবনও তৈরি হয়েছে। তা নাকি বিশেষ রকম তন্ত্র-মন্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র দ্বারা সমস্ত 'অশুভ শক্তি' ও 'কুনজর' থেকে একেবারে সুরক্ষিত! বেড়েছে তার ঠাটবাট, জাঁকজমক। বহুমূল্য 'সেঙ্গল' সেখানকার পাহারাদার। আছে অনেক কিছু। কিন্তু গণতন্ত্র? তার অস্তিত্ব আছে কি?

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে যদি ধরেও নিই 'দেবতা নাই ঘরে', তা হলে— 'যেথায় মাটি কেটে করছে চাষা চাষ'— সেখানে কি পাওয়া যাবে প্রধানমন্ত্রী কথিত গণতন্ত্রের দেবতাকে? আন্দোলনরত কৃষকদের উপর মোদি সরকারের পুলিশের লাঠি, ড্রোন থেকে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ার ধুম দেখে তাও তো বলা যাবে না! অন্য কোনও ক্ষেত্রেও কি গণতান্ত্রিক পরিবেশের কোনও খোঁজ এ দেশে পাওয়া যাবে? বরং আজকের ভারতে চাষি, মজুর, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা পর্যন্ত সরকারের সামান্য সমালোচনা করতে গেলেও পেয়াদায় তা শুনছে কি না বুঝতে চারপাশ দেখে নেন।

আর যাঁরা গণতন্ত্রের 'মন্দির' সংসদে বসে কথা বলার অধিকারী, সেই সাংসদরা? তাঁরাও কি অবাধে কথা বলতে পারছেন? এমনিতেই আজকের সাংসদ যাঁরা তাঁদের অধিকাংশকেই আর যাই হোক এ দেশের হতদরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি বলা যায় না। তাঁরা অধিকাংশই বহু কোটি টাকার মালিক, বিত্তবান মানুষ। ভোটের প্রচারের সময়টুকু ছাড়া তাঁরা সাধারণ মানুষের নাগালের অনেক বাইরে। আর এ দেশে এখন ভোট ব্যবস্থা যা, তাতে গরিব-মধ্যবিত্তের পক্ষে ভোটে দাঁড়ানোই দুষ্কর। কিন্তু, সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে আপাতত শুধু সংসদের মধ্যে সাংসদদের কথা বলার অধিকারটুকুতেই আলো ফেলা যাক।

রেকর্ড বলছে ১৯৫২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সংসদে কিছুটা অন্তত বিস্তারিত আলাপ আলোচনা, বিতর্ক, বিলের খুঁটিনাটি নিয়ে বিচারের সুযোগ ছিল। এই সময়কালে বছরে গড়ে ৬৫টি করে বিল সংসদে পাশ হয়েছে। কিন্তু তারপর সেই গড় নেমে এসেছে ৪৮-এ। আর নরেন্দ্র মোদির দ্বিতীয় দফায় ২০১৯-২০২৪-এর সপ্তদশ লোকসভা নেমেছে এই নিরিখে সবচেয়ে নিচে। ১৯৯০-এর আগে সংসদে পেশ করা ৭০ শতাংশ বিলই পাশ করানোর আগে খুঁটিয়ে যাচাই করার জন্য নানা সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হত। ফলে শাসক এবং বিরোধী উভয় পক্ষের সদস্যরাই বিল নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনার সুযোগ পেতেন। কিন্তু সপ্তদশ লোকসভায় ৮৪ শতাংশ বিলই সংসদীয় কমিটিতে কোনও পর্যালোচনা ছাড়াই পাশ হয়েছে। অর্থাৎ সরকারের মর্জিই আইন, তা খুঁটিয়ে বিচার করার সুযোগ সাংসদদেরও নেই! অবশ্য নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সপ্তদশ লোকসভা রেকর্ড করেছে কোনও আলোচনা ছাড়া কয়েক মিনিটে একাধিক বিল পাশ করার কৃতিত্বে।

কমেছে সংসদে আলাপ আলোচনার সময়। ১৯৫২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত প্রতিটি লোকসভার মেয়াদে ৫৫০দিন করে অধিবেশন বসেছে, বিতর্ক-আলোচনার গড় সময় ৩৫০০ ঘণ্টা। পরে তা কমতে কমতে ১৭তম লোকসভার পাঁচ বছরে মাত্র ২৭৪ দিনে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫২ থেকে ধরলে এটিই সর্বনিম্ন। দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, মুলতুবি প্রস্তাব, নোটিস ইত্যাদি যা কিছুর মাধ্যমে সাংসদরা তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন, তার প্রত্যেকটির সুযোগ দিনে দিনে কমেছে। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিসের ভিত্তিতে সরকারের কাছে জবাবদিহি চেয়ে আলোচনা ১৯৫৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ছিল প্রতি লোকসভার মেয়াদকালে গড়ে ৩০০টি। তারপর তা কমতে কমতে হয়েছিল ৪০, সপ্তদশ লোকসভায় মাত্র ১টি। জরুরি ভিত্তিতে কোনও বিষয় আলোচনার জন্য মুলতুবি প্রস্তাব গত পাঁচ বছরে একটিও গৃহীত হয়নি।

রাজ্যসভায় বিরোধী সাংসদদের কোনও ধরনের নোটিসই গৃহীত হয়নি। বিরোধীদের আনা ৩০০টি প্রশ্ন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যত দিন গেছে কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আলোচনার সময় ক্রমাগত কমেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলির বাজেট ধরে ধরে নির্দিষ্ট আলোচনা ১৯৯০-এর আগে কোনওদিন বাদ যায়নি, তার পর থেকে মন্ত্রক ধরে কোনও আলোচনা বন্ধ। গলার জোরেই বাজেট পাশই রীতি দাঁড়িয়েছে। সপ্তদশ লোকসভার পাঁচ বছরে কোনও ডেপুটি স্পিকার ছিলেন না, কারণ রীতি অনুযায়ী একজন বিরোধী দলের সদস্যকে এই পদে নির্বাচিত করতে হয়। নরেন্দ্র মোদির গণতন্ত্রের মন্দিরে তা অসম্ভব। বিরোধী সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর নাম করে কিছু বললেই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তা কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের নিয়ে সংসদের প্রশ্ন তোলায় বিরোধী সাংসদের সদস্য পদ গেছে। দেশবাসী দেখেছে এই সংসদে সমস্ত বিরোধী সাংসদকে বহিষ্কার করে দিয়ে সরকার কী ভাবে একের পর এক বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে। বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবক্তারা তো বটেই, এ দেশের স্বাধীনতার সময়েও সংসদে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা বোধহয় এমন দৃশ্য কল্পনা করতে পারতেন না। আজ নরেন্দ্র মোদি সাহেব এমন এক প্রধানমন্ত্রী, যিনি কোনও দিন সাংবাদিক সম্মেলনে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি। শুধু তাই নয়, তিনি ১০ বছরে কোনও দিন রাজ্যসভা বা লোকসভাতে কোনও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেননি, তাঁর হাতে থাকা কোনও দপ্তরের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি। তিনি বলতে দড়, শুনতে নন। সংসদে বসে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে বিরোধী কণ্ঠস্বর চাপা দেওয়া নরেন্দ্র মোদির অনুচর বাহিনীর কাছে তথ্য-যুক্তি-বিতর্ক— এ সব অন্য গ্রহের বিষয়। ফলে ভারতীয় সংসদে এখন গলাবাজিই সত্য। সেখানে মানুষের ব্যথা-বেদনা-অভাব-সঙ্কট নিরসনের দাবি নিয়ে আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না।

সংসদীয় ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞ এবং লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ সুভাষ কশ্যপের বহু পরিশ্রমে সংকলিত তথ্য (দ্য হিন্দু, ১৪.০২.২০২৪) এবং গবেষণা একটা সরল সত্যকে তুলে ধরেছে, ১৯৯০-এর পর থেকে ভারতে সাংসদদের মুখ খোলার সুযোগ ক্রমাগত কমে চলেছে। নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রিত্ব তাকে একেবারে তলানিতে নামিয়ে দিয়েছে।

কেন এমনটা হল? বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ভাগ ক্রমাগত ক্ষয়ের পথে যেতে শুরু করেছে বহু দিন থেকেই। কিন্তু ডঃ কশ্যপ দেখিয়েছেন, তার ক্ষয় আরও দ্রুত শুরু হয়েছে ১৯৯০-এর পর থেকে। কেন? তা বুঝতে গেলে তাকাতে হবে আর একটা দিকে। ১৯৯০-এর আগে দুনিয়াতে সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল। তার ফলে বুর্জোয়া শাসকদের উপরেও চাপ থাকত তাদের নিজ নিজ দেশের জনগণকে অন্তত একটু নিঃশ্বাস ফেলার পরিসর দেওয়ার। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনগণকে যে ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার দিত তার সাথে বুর্জোয়া ব্যবস্থার নিতান্ত খণ্ডিত অধিকারের পার্থক্য জনগণের চোখে ধরা পড়তই। পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকদের আশঙ্কা ছিল এতে সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ আরও বেড়ে যেতে পারে। ফলে কিছু কিছু অধিকার তারা জনগণকে দিত, যাতে নিজেদের আসল চেহারা ঢেকে রাখা গণতন্ত্র নামক আলখাল্লাটার ফুটোগুলো তারা আড়াল করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে বুর্জোয়া শাসকদের আর সে ভয় নেই। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকদের ভরসা ছিল বিশ্বায়ন, উদারিকরণের ওপর। যদি এর মাধ্যমে সর্বগ্রাসী সংকট থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একটু রেহাই পায়! কিন্তু এর ফলে এই ব্যবস্থার সামগ্রিক সংকট আরও বেড়েছে। পুঁজি ক্রমাগত বেশি বেশি করে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মালিকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে। পুঁজি যত কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাষ্ট্র ততই তার গণতান্ত্রিক চরিত্র বেশি বেশি করে হারিয়ে একচেটিয়া পুঁজির লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। একচেটিয়া পুঁজির সেবা করাই এখন রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রজারা নিছক মজুরি-দাস মাত্র। আজ একচেটিয়া পুঁজির শক্তিতে বলীয়ান তাদের সেবাদাস দলগুলির প্রবল দাপটে ক্ষুদ্র-মাঝারি পুঁজি, আঞ্চলিক পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দলগুলি প্রবল চাপে। তারাও বৃহৎ পুঁজি-মালিকদের প্রসাদের আশায় সব নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে নানা আপস করছে। **বুর্জোয়া শ্রেণি চায় তাদের সেবাদাস একটি দল নিরঙ্কুশভাবে শাসন চালাক। আর গণতন্ত্রের নাম করে অন্য একটি তাদেরই সেবাদাস দল অথবা একই ধরনের দলগুলির জগাখিচুড়ি জোট বিরোধী হিসাবে থাকুক। শাসক শ্রেণি তার প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও এই দলকে, কখনও ওই দলকে গদি পাইয়ে দেবে, এর নামই হল নির্বাচন এবং পবিত্র সংসদীয় গণতন্ত্র!** আজ পুঁজিবাদের সংকট এত গভীর যে, পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থের খাতিরেও জনগণের প্রকৃত দাবি শোনার মতো একটু গণতান্ত্রিক পরিসর ছেড়ে রাখতে পুঁজিপতি শ্রেণি নারাজ। ফলে আজকের সংসদীয় ব্যবস্থাটা টিকে আছে এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার একটা প্রাণহীন খোলসের মতো। তার গণতান্ত্রিক প্রাণসত্তা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে চলেছে মৃত্যুর পথে। ফলে, দেশে সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দিন, সংসদের ভিতরেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ অধিষ্ঠান করবে, সাংসদরা কার্যকরী বিতর্ক, আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকারি নীতির চুলচেরা বিশ্লেষেণে সক্ষম হবেন— এ বড়ই দুরাশা।

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের মধ্যরাত্রিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু সংসদে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'নিয়তির অভিসারে' এগিয়ে চলেছে ভারতীয় গণতন্ত্র। দেখা যাচ্ছে, নিয়তি নয়, ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে সেই পথেই— যা তার জন্য অবধারিত বলে ঘোষণা করেছে মার্ক্সবাদী বিজ্ঞান। এই গণতন্ত্র চলেছে তার অবধারিত বিলোপের দিকে। যথার্থ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করার মতো তাকত নিয়ে সঠিক নেতৃত্বে কবে শ্রমিক শ্রেণি উঠে দাঁড়াতে পারবে, অপেক্ষা শুধু সেই ক্ষণটির।

সপ্তদশ লোকসভায় ৮৪ শতাংশ বিলই সংসদীয় কমিটিতে কোনও পর্যালোচনা ছাড়াই পাশ হয়েছে। অর্থাৎ সরকারের মর্জিই আইন, তা খুঁটিয়ে বিচার করার সুযোগ সাংসদদেরও নেই! অবশ্য নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সপ্তদশ লোকসভা রেকর্ড করেছে কোনও আলোচনা ছাড়া কয়েক মিনিটে একাধিক বিল পাশ করার কৃতিত্বে।

আদানিকে অবাধ লুঠের সুযোগ

একের পাতার পর

খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষকে। মুনাফা লুটের লালসায় বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থার কাছে ভাল কয়লার নাম করে নিচু মানের বেশি দূষণ সৃষ্টিকারী কয়লা বিক্রি করে এমনকি দেশের মানুষের শারীরিক সুস্থতাকে পর্যন্ত বলি চড়িয়েছে আদানিরা! পাশাপাশি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠে গেছে যে, কীসের বিনিময়ে তারা আদানিদের এই ভয়ঙ্কর দুর্নীতি বছরের পর বছর ধরে অবাধে চালিয়ে যেতে দিল! বিপুল পরিমাণ সরকারি রাজস্ব, যা অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো যেত, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কোন বাধ্যতায় তা আদানিকে নিজের সিন্দুকে ভরে নিতে দিল? বিনিময়ে মোদিজির দল ক'টেম্পো টাকা পেল?

সংগঠিত অপরাধ ও দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধানকারী সাংবাদিকদের সংস্থা 'অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড কোরাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট' সংক্ষেপে ওসিসিআরপি-র সংগৃহীত তথ্য, চালান ও অন্যান্য কাগজপত্র খতিয়ে দেখে ফিনান্সিয়াল টাইমস আদানির এই বিপুল লুট ও দেশের মানুষকে প্রতারণার গোটা চিত্রটি নতুন করে তুলে ধরেছে।

ফিনান্সিয়াল টাইমস লিখেছে, ২০১৩-র ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়া থেকে আদানিদের কেনা কয়লা-ভরা জাহাজটি রওনা হওয়ার পর পরই বন্দর-দফতর একটি সার্টিফিকেট প্রকাশ করে। সেখানে প্রেরক ও প্রাপকের নাম হিসাবে ইন্দোনেশিয়ার সংস্থা 'জনলিন' ও 'ট্যানগেডকো'-র উল্লেখ আছে। সার্টিফিকেটে প্রতি টন কয়লার দাম লেখা আছে ২৮ মার্কিন ডলার, যা নিম্ন মানের কয়লার সেই সময়কার বাজারদর। ট্যানগেডকো-র হাতে পৌঁছনোর আগে এই জাহাজের কাগজপত্র ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডের একটি মধ্যস্থতাকারী কোম্পানি সুপ্রিম ইউনিয়ন ইনভেস্টর লিমিটেডের কাছে পাঠানো হয়। উল্লেখ করা ভাল, এই ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড কর-ফাঁকি দেওয়ার একটি স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত। ওই সুপ্রিম ইউনিয়ন ইনভেস্টর আবার এই একই জাহাজের জন্য সিঙ্গাপুরে আদানির কোম্পানির প্রধান দফতরের জন্য একটি চালান তৈরি করে। সেই চালানে কয়লার দাম লেখা ছিল টন পিছু ৩৩.৭৫ ডলার। মান হিসাবে উল্লেখ ছিল 'প্রতি কিলোগ্রামে ৩৫০০ কিলোক্যালরির কম'— অর্থাৎ এই কয়লার প্রতি কিলো থেকে ৩৫০০ কিলোক্যালরির কম শক্তি উৎপন্ন হবে, যা নিম্ন মানের কয়লায় হয়ে থাকে। কিন্তু এর পরেই আদানির সংস্থা যখন ট্যানগেডকো-র উদ্দেশ্যে এই কয়লা জোগান দেওয়ার চালান তৈরি করে, দেখা যায়, সেখানে সমস্ত হিসেবই পাল্টে গেছে! ওই চালানে নিম্নমানের এই কয়লাই কোনও এক যাদুমন্ত্রে কিলো প্রতি ৬ হাজার কিলোক্যালরি শক্তি উৎপাদনকারী অত্যন্ত উন্নত মানের কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং তার দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি মেট্রিক টনে ৯১.৯১ ডলার!

এইভাবে নিচু মানের কমদামি কয়লা আমদানি করে তাকে উঁচু মানের কয়লা বলে চালানো এবং চড়া দামে জোগান দিয়ে বিপুল মুনাফা লোটার ঘটনা এক-আধবার ঘটেছে এমন নয়। ওসিসিআরপি-র তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ফিনান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, ২০১৪-র জানুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে কমপক্ষে ২২টি জাহাজে বিপুল পরিমাণ কয়লা আমদানি করে ট্যানগেডকো-কে বিক্রি করেছে আদানির সংস্থা এবং অন্যায় ভাবে লুটে নিয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা।

গত বছর লন্ডনের ফিনান্সিয়াল টাইমস আরও একটি বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করেছিল। তারা জানিয়েছিল, ২০২১ থেকে '২৩-এর মধ্যে ভারতে আমদানি করা কয়লা বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি দামে বিক্রি করানোর জন্য আদানিরা কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী সংস্থাকে ৫০০ কোটি ডলার ঘুষ দিয়েছিল। কয়লা-দুর্নীতিতে আদানির বেআইনি মুনাফার পরিমাণ যে কতখানি বিপুল, এ থেকে হয়তো তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে সেই সময়ে কিছুটা শোরগোল উঠলেও তা বেশি দূর গড়ায়নি।

চড়া দাম দিয়ে নিচু মানের কয়লা কিনতে গিয়ে তামিলনাড়ুর সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থা ট্যানগেডকোর কত টাকা নষ্ট হয়েছে, তার হিসেব দিয়েছে সেখানকার একটি অসরকারি সংস্থা 'আরাপ্পোর ইয়াক্কাম'। সংস্থাটির হিসাব, এই কারণে ২০১২ থেকে ২০১৬-র মধ্যে ট্যানগেডকোকে হারাতে হয়েছে মোট ৬ হাজার কোটি টাকা। এর প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ ৩ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে আদানির সরবরাহ করা কয়লা কেনার কারণে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে ট্যানগেডকো কর্তৃপক্ষ সম্পর্কেও। ২০১৭ সালের একটি রিপোর্টে খোদ সিএজি-ই প্রশ্ন তুলেছিল যে, বেশি দাম দিয়ে খারাপ মানের কয়লা পাওয়া সত্ত্বেও কোন যুক্তিতে তামিলনাড়ুর এই সরকারি সংস্থাটি কয়লা কেনার জন্য আদানিদের সংস্থাকে নির্বাচন করে।

বাস্তবে আদানির দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রে 'স্যাঙাৎতন্ত্রে'র রমরমাকেই তুলে ধরল, যেখানে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাটাই কাজ করে চলে গুটিকয়েক একচেটিয়া পুঁজিপতির মুনাফা রক্ষার স্বার্থে। আগেই বলা হয়েছে, ডিআরআই ২০১৪ সালে কয়লা-দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। ২০১৭ সালে এ বিষয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের খ্যাতনামা আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ দিল্লি হাইকোর্টে যান। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে ২০১৮ সালে ডিআরআই আদালতকে জানায়, সিট গঠনের প্রয়োজন নেই। এরপর ২০১৯-এ বম্বে হাইকোর্টে আদানিরা একটি মামলায় জিতে যাওয়ার পর ওই আদালত ডিআরআই-এর ওপর আদানির কয়লা আমদানি সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ডিআরআই এরপর তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায়। কিন্তু তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত এই মামলার আর কোনও অগ্রগতি হয়নি।

এ কথা আজ সকলেরই জানা যে, একচেটিয়া পুঁজিপতি গৌতম আদানির প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রে বিজেপি শাসনের গত দশ বছরে মোদিজি ও তাঁর সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আশীর্বাদ আদানি সাহেবের আকাশছোঁয়া উত্থানে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এর আগে তিনি ছিলেন গুজরাটের একজন সাধারণ শিল্পপতি মাত্র। ফলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, কয়লা-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর দশ বছর পার হয়ে গেলেও কোন যাদুমন্ত্রে আদানি সাহেব আজও বহাল তবিয়তে তাঁর অনৈতিক কাজ-কারবার চালিয়ে যেতে পারছেন। অপরাধের শাস্তি হওয়া দূরের কথা, দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করা সত্ত্বেও খোদ সরকারি প্রশাসন পর্যন্ত এত বড় একটা দুর্নীতির তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না কেন, কোন শক্তি এর পিছনে কাজ করছে, সে কথাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। সম্প্রতি ২১টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে এক চিঠিতে আদানির বিরুদ্ধে তদন্তের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। চিঠিতে তাঁরা বলেছেন, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা 'দ্য ল্যান্সেট'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে যেখানে প্রতি বছর ২০ লক্ষ মানুষ দূষিত বাতাসে শ্বাস নিতে বাধ্য হওয়ার কারণে প্রাণ হারান, সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আদানির আমদানি করা বিপুল দূষণ সৃষ্টিকারী নিচু মানের কয়লার ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।

অথচ কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকারের কোনও হেলদোল নেই। ভোটের মরশুমে বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে সরকারি এজেন্সিগুলিকে লেলিয়ে দিতে, সরকারের কোনও নীতির বিরোধিতাকে 'দেশদ্রোহিতা' বলে দেগে দিয়ে প্রতিবাদীদের জেলে ভরতে এই সরকারের যতখানি তৎপরতা, আদানিদের মতো একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজির মালিকদের নির্লজ্জ লুঠের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তাদের ততখানিই উদাসীনতা। আসলে পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবেই নিজের সরকারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থের মোদিজিদের এই 'জো হুজুরি'। শুধু বিজেপি সরকারের আমলেই নয়, এই লুটপাটের শুরু অনেক আগে থেকে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন পূর্বতন ইউপিএ সরকারের আমলে জিন্দাল, মিত্তালদের মতো একচেটিয়া কারবারিদের বেআইনি পথে কয়লা ব্লক বেচে দেওয়া হয়েছিল। এইসব লুটেরা কোম্পানিগুলি সেই কয়লা বিপুল দামে বাজারে বিক্রি করে দেশের মানুষের কাছ থেকে বিরাট অঙ্কের টাকা লুটে নিয়েছিল। তাই নিয়ে সিবিআই তদন্তও হয়। যদিও অভিযুক্ত তৎকালীন শাসক দল কংগ্রেস ২০১৩ সালে সিবিআই-এর সেই রিপোর্ট পাল্টে দিয়েছিল।

নির্বাচনী জনসভাগুলিতে মোদিজি বলে চলেছেন, সাধারণ মানুষের উপর যারা লুটপাট চালাচ্ছে, নির্বাচিত হলে তাঁর সরকার তাদের নাকি জেলে পাঠাবে। দুর্নীতিগ্রস্তদের সম্পত্তির নাকি এক্স-রে করবেন তিনি। মানুষ অবশ্য এইসব 'জুমলা'য় আর বিশ্বাস করেন না। গত দশ বছর ধরে আদানিদের মতো লুটেরা পুঁজিপতিদের সঙ্গে মোদিজি ও তাঁর সহচরদের গলায় গলায় বন্ধুত্ব তাঁরা দেখেছেন ও তার ফল ভোগ করে চলেছেন। কংগ্রেস হোক বা বিজেপি, ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি সরকারে বসার সুযোগ পেলে যে পুঁজিপতি শ্রেণির তাঁবেদারিকেই পাখির চোখ করে কাজ করে, ১৯৫২ সাল থেকে একের পর এক নির্বাচিত সরকারগুলির কার্যকলাপ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ফলে আদানিদের মতো কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের এই নির্মম লুঠ এবং পেটোয়া সরকারগুলির পুঁজিপতি শ্রেণির এই নির্লজ্জ পদসেবার বিরুদ্ধে সঠিক নেতৃত্বে জোট বেঁধে আন্দোলনে সামিল হওয়া ছাড়া পথ নেই সর্বস্বহারা খেটে-খাওয়া মানুষের। (তথ্যসূত্র ঃ ফিনান্সিয়াল টাইমস, নিউজলন্ড্রি ও দ্য ওয়্যার, ২২ মে '২৪)

বিষাক্ত খাদ্যপণ্যে অবাধ ছাড়পত্র মোদি সরকারের

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ এর এপ্রিল পর্যন্ত ভারত থেকে রপ্তানি করা ৫২৭টি খাদ্যপণ্যে বিষ পেয়েছে বলে অভিযোগ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের। একই অভিযোগ প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালেরও। ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা এবং মান বিষয়ক কর্তৃপক্ষ এবং এফএসএসএআই জানিয়েছে, ২০২১-২৩ সাল জুড়ে যে ৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৮৫টি খাবারের নমুনা তারা পরীক্ষা করেছেন। তার মধ্যে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৯০৭টি নমুনাই নিরাপত্তা সূচক মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশ খাদ্য মানুষের শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক।

ভারতের খাদ্যপণ্য নিয়ে অভিযোগ রয়েছে আরও। সম্প্রতি এম ডি এইচ এবং এভারেস্টের চারটি মশলায় নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে সিঙ্গাপুর, হংকং এবং নেপাল। তাদের অভিযোগ সেগুলিতে মাত্রাতিরিক্ত হারে এথিলিন অক্সাইড মেশানো আছে, যা দীর্ঘদিন খেলে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। অভিযোগ উঠেছে মশলা ও ভেষজ খাদ্যপণ্যে অনুমোদিত সীমার ১০ গুণ বেশি কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ থাকলেও সেগুলিকে অনুমতি দিচ্ছে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কর্তৃপক্ষ। কোন শক্তিতে বলিয়ান হয়ে গুণমানে অনুত্তীর্ণ খাদ্য বিক্রির অনুমতি দিচ্ছে?

পরীক্ষায় যে খাদ্যগুলি উত্তীর্ণ হল না তাদের প্রস্তুতকারী সংস্থার মালিকদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার? অর্থলোভী মুনাফাখোর এই মালিকরা মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে এবং তার বিনিময়ে নিজেদের ব্যবসার সাম্রাজ্য গড়ে তুলছে, মুনাফার পাহাড় বানাচ্ছে। কেন্দ্রে মোদি সরকারের কল্যাণহস্ত এদের মাথায় না থাকলে, রাজ্যে রাজ্যে সরকারগুলি দেখেও না দেখার মনোভাব না নিলে মানুষের জীবন নিয়ে এমন হীন কাজ তারা অনায়াসে করতে পারতো কি? বছরের পর বছর ধরে এই জিনিস চলছে। এ বার দশ গুণেরও বেশি কীটনাশকের অবশেষ যুক্ত খাবার বাজারে বিক্রির অনুমোদনের পিছনে অর্থের খেলা কত রয়েছে তারও তদন্ত হওয়া দরকার।

মুনাফা বা সর্বোচ্চমুনাফা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। এই অর্থ ব্যবস্থা এত পচে গেছে যে মুনাফার লোভে খাদ্যে, ওষুধে ভেজাল দিতেও এদের হাত কাঁপে না। যে শিশু খাদ্য মালিকের ঘরের সন্তানও খাবে, যে ওষুধ মালিকদেরও খেতে হয়, সেখানেও ভেজাল দিতে এতটুকু নিরস্ত হয় না। এদের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য মুনাফার তুলনায় কিছুই না। পুঁজির সেবক সরকারের কাছেও মানুষের জীবনের কানাকড়ি মূল্য নেই। থাকলে তদন্ত হত, অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা হত। এই ঘটনা আবারও দেখিয়ে দিল এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে আজ কত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এরপরেও এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সেবা করে চলেছে সংসদীয় দলগুলি।

ভোটকর্মীদের জন্য বিনা পয়সায় রান্না করার নির্দেশ হরিয়ানার মিড ডে মিল কর্মীদের

প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

হরিয়ানার বিভিন্ন বুথে ভোটকর্মীদের খাওয়াতে মিড ডে মিল কর্মীদের রান্না করার নির্দেশ দিয়েছে সে রাজ্যের সরকার। এর জন্য তাঁদের কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হবে না। এস ইউ সি আই (সি)-র হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড রাজেন্দ্র সিং অ্যাডভোকেট এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ২৪ মে চিঠি লিখে দাবি করেছেন, এই কাজের জন্য মিড ডে মিল কর্মীদের নির্দিষ্ট ভাতা ছাড়াও অন্তত ২০০০ টাকা ভাতা দিতে হবে।

সপ্তাহে তিন-চার দিনই কাজ থাকছে না চা-বাগানে

বৃষ্টির অভাব এবং পোকার উপদ্রবে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে উৎপাদন মার খাচ্ছে। চা পাতা ঠিকমতো হচ্ছে না। ফলে বহু বাগানেই কাজের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সপ্তাহে ৬ দিনের পরিবর্তে কোনও কোনও বাগানে তিন দিন কাজ করানো হচ্ছে। কোনও কোনও বাগানে চার দিন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে কোনও কোনও বাগান স্থায়ী শ্রমিকদেরই পুরো ৬ দিন কাজ দিতে পারছে না। সব চেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন ক্যাজুয়াল কর্মীরা, অস্থায়ী কর্মীরা। যে শ্রমিকদের শ্রমশক্তি কাজে লাগিয়ে মালিক বাগান চালু রাখে, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাজনিত সঙ্কটের বোঝা মালিকরা চাপিয়ে দিয়েছে সেই শ্রমিকের উপর। সরকারও উদাসীন। কী ভাবে এই সঙ্কট মোকাবিলা করে উৎপাদন সচল রাখা যায় তা নিয়ে মালিক পক্ষেরও তৎপরতার অভাব। কৃত্রিমভাবে সেচ দিয়ে বাগানের উৎপাদন অব্যাহত রাখা যায় কি না, সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের হেলদোল নেই। সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন যে শ্রমিক পরিবারের কাজ নেই, তারা কী করে বেঁচে থাকবে তা নিয়ে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ আর্থিক সাহায্য সরকার থেকে করা দরকার।

(সূত্র ঃ দ্য টেলিগ্রাফ ১৮ মে ২০২৪)

নির্বাচন নিয়ে নাগরিক সভা বাঁকুড়ায়

‘ভোটের দ্বারা জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব কি’ বিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজন করেছিল ‘শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল কমিটি’ বাঁকুড়া জেলা। ২০ মে বাঁকুড়ার সিএমওএইচ সভাগৃহে তা পরিচালনা করেন কমিটির সম্পাদক ও শিক্ষক রঞ্জিত মাহাত।

আলোচনায় অংশ নেন কমিটির সভাপতি ডাঃ নীলাঞ্জন কুণ্ডু, সহ সভাপতি ডাঃ সুভাষ মণ্ডল, সহ সভাপতি ডাঃ সজল বিশ্বাস, পরিসংখ্যানবিদ লবকুমার খাঁ, প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সুবোধ সিংহ, অধ্যাপক বিভাস সরকার, শিক্ষক সুবোধ কুমার বল, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী অমৃত ও জয়দেব পাল। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক নেতা ও সমাজকর্মী শিশির সরকার ও নাট্যব্যক্তিত্ব ও লেখক মধুসূদন দরিপা। বক্তারা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। মুখ্য আলোচক ছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক কমল সাঁই। আলোচনায় উঠে আসে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচনে শুধুমাত্র সরকারের পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্রের শোষণমূলক চরিত্রের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। ফলে সেই দলের প্রার্থীকেই ভোট দেওয়া জরুরি যারা জনস্বার্থে আন্দোলন গড়ে তোলায় পরীক্ষিত।

জয়নগরে প্রচার

প্রচারে জয়নগর কেন্দ্রের এসইউসিআই(সি) প্রার্থী কমরেড নিরঞ্জন নস্কর

ত্রিপুরায় জিবিপি হাসপাতালে পরিষেবা উন্নত করার দাবি

ত্রিপুরায় বিজেপিশাসিত একমাত্র রেফারেল হাসপাতাল জিবিপি-র পরিষেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা রাজ্যের জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। রাজ্যের জেলা হাসপাতালগুলি থেকে মুমূর্ষু রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু এখানে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর চূড়ান্ত অভাব। ওয়ার্ডগুলিতে দিবারাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স ও ওয়ার্ডবয় না থাকায় চিকিৎসা পান না সাধারণ মানুষ। প্রয়োজনভিত্তিক জীবনদায়ী ওষুধও হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও চরম অব্যবস্থা। জরুরি চিকিৎসা বিভাগও সব সময় সক্রিয় থাকে না। বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা ছাড়াও পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা অপর্যাপ্ত। শৌচাগারগুলিতে জলের ব্যবস্থা অপ্রতুল, ঠিকমতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও করা হয় না। ফলে রাজ্যের মানুষ এই হাসপাতালের উপর ভরসা হারিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য বাইরের রাজ্যে ছুটতে বাধ্য হন।

এই অব্যবস্থাগুলি দূর করার দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে ১৫ মে জিবিপি হাসপাতালের সুপারকে স্মারকপত্র দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

ভোট শেষ হতেই ব্যাপক লোডশেডিং

মধ্যপ্রদেশে বিক্ষোভ এস ইউ সি আই (সি)-র

মধ্যপ্রদেশের শহর-গ্রামে যখন তখন লোডশেডিং স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তীব্র গরমের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ লোডশেডিং যেমন দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে, পানীয় জল সহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে।

এর বিরুদ্ধে ২২ মে গুনা শহরে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষ। দলের জেলা সম্পাদক মনীশ শ্রীবাস্তব বলেন, ভোট মিটে যেতেই চাহিদা বৃদ্ধির অজুহাতে বিদ্যুৎ ছাঁটাই শুরু হয়েছে।

ভোটের সময় লোডশেডিং হয়নি, তা হলে তার ঠিক পরেই চাহিদা এত বাড়তে পারে কি? বণ্টন কোম্পানির দপ্তরে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানানো হয়— লোডশেডিং বন্ধের জন্য সমস্ত ধরনের বাণিজ্যিক ও গৃহস্থ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহের পৃথক লাইন রাখতে হবে, লোডশেডিংয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ভোটের হিসাবে গরমিল

একের পাতার পর

জানিয়েছিল। প্রতিটি ভোটেই অনেক রাত পর্যন্ত ভোট পড়ে, এটা নতুন কিছু নয়। কিছু প্রখ্যাত সংবাদমাধ্যমের মতে, প্রথম চারটি দফাতেই এই ভোটের পার্থক্য ১.০৭ কোটি। অর্থাৎ যে ৩৭৯টি কেন্দ্রে ইতিমধ্যে ভোট হয়েছে তার প্রতিটিতে গড়ে ২৮ হাজার ভোট বেড়ে গেছে।

এই নজিরবিহীন ঘটনা নির্বাচন পরিচালনা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ এবং আশঙ্কার জন্ম দেয়। এটা যদি সত্য হয় তা হলে এই ঘটনা অবাধ স্বচ্ছ নির্বাচন এবং গণতন্ত্রের বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়।

ভোটদানের হারের চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশে দেরি, সংশোধিত হিসাবে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং লোকসভা ক্ষেত্র ধরে বুথভিত্তিক ভোট সংখ্যার হিসাব না দেওয়া জনমনে বহু প্রশ্ন তুলেছে। অবাধ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে ভোট পরিচালনার স্বার্থে এবং জনগণের ভোট সঠিকভাবে গণনার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে ১৭সি ফর্ম আপলোড করা হোক। একই সাথে নির্বাচনী ক্ষেত্র ধরে বুথভিত্তিক ভোটের সংখ্যা প্রকাশ করতে হবে এবং ভোট গণনার সময় তা সঠিকভাবে মিলিয়ে দেখতে হবে।

পাঠকের মতামত

টাকার জোরের গণতন্ত্র!

বিদায়ী সপ্তদশ লোকসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ঘোষিত সম্পদের গড় প্রায় ২১ কোটি টাকা— ২১-এর পর ৭টা শূন্য বসাতে হয়েছে! (যা ঘোষণা হয়নি তা নিয়ে কোনও কথাই হচ্ছে না। যেমন, কে কোন আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, কিংবা বিদেশের ব্যাংকে কার কত টাকা আছে ইত্যাদি)

কাদের প্রতিনিধি তাঁরা, তাদের খোঁজখবর নেওয়া যাক। ২০২৩ সালেও ভারতের দারিদ্র রেখা ছিল শহরে মাসে ১৯০০ টাকা ও গ্রামাঞ্চলে ১৬০০ টাকার সামান্য বেশি। বর্তমানে মাসে যাদের আয় ১৬০০-১৯০০ টাকা, তারা দু'বেলা খাবার জোগাড় করতে পারবে কি না, এই প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে। সরকারি হিসাব মেনে নিলেও দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যাটা দেশে ৫ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ ১৩০ কোটির দেশে, ৬ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি মানুষ এখনও দারিদ্রসীমার নিচে।

মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে হিসাবটা কেমন? দেশের মোট কর্মরত জনসংখ্যার ১০ শতাংশের কম সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত। চাকরিজীবী শ্রেণির মধ্যে মাথাপিছু গড় মাসিক আয় ৩২ হাজার টাকার কাছাকাছি। অতি ধনী ও উপরের এই ১৫ শতাংশের বাইরের বাকি মানুষদের আয় এর মাঝামাঝি।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ধরা হলে পশ্চিমবঙ্গে একজন সাংসদ গড়ে ২১ লাখ ৭৫ হাজার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন। সাংসদদের ৪০ শতাংশ নিজেদের পেশা হিসেবে পূর্ণ সময় রাজনীতি বা সমাজসেবার কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলে তাঁরা এমন বিপুল ঘোষিত সম্পদের মালিক হন কী ভাবে? ক্ষেত্র বিশেষে সমাজসেবা কি তা হলে অতি অর্থকরী?

তা হলে এই অতি-ধনী সাংসদরা দেশের জনসাধারণের কোন অংশের প্রতিনিধি? কোন অর্থে তাঁরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন? দারিদ্রসীমার নিচে থাকা পরিবারের সদস্যদের জীবন কেমন ভাবে কাটে সে কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। কিন্তু কোনও মধ্যবিত্তের জীবনের সংকট, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উত্থান-পতনের কোনও আঁচও কি কোটি কোটি টাকার মালিক এইসব প্রতিনিধিরা টের পান? তাঁদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব?

গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থাটিকে যে ভাবে ব্যয়বহুল করে তোলা হয়েছে, তাতে কি কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং নির্বাচিত হওয়া সম্ভব? টাকার জোরই যদি জনপ্রতিনিধি হওয়ার একমাত্র শর্ত হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাকে আর গণতন্ত্র বলা যায় কি না, ভাবা দরকার।

ডাঃ দেবেন্দ্র প্রসাদ মহন্ত
সল্টলেক, কলকাতা

যক্ষ্মার ওষুধের জোগান বন্ধ করেছে মোদি সরকার

লক্ষ লক্ষ রোগীর জীবন বিপন্ন

বিগত প্রায় ছমাস দেশের কম করে আটাশ লক্ষ যক্ষ্মা রোগী ও তার পরিবার একটু ওষুধ পাওয়ার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন জেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কখনও রাজ্য জুড়ে। তাতেও অনেক সময় শেষ রক্ষা হচ্ছে না। ওষুধ যোগাড় করতে না পারার ফলে অজান্তেই উক্ত ওষুধের বিরুদ্ধে টিবি রোগের জীবাণু রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর হিমশীতল হাওয়া দোলা দিয়ে যাচ্ছে তাদের গায়ে। পরিবারের আশঙ্কা উৎকণ্ঠার অন্ত থাকছে না।

বিষয়টি কী এবং কেন? টিবি এমন একটি ছোঁয়াচে রোগ যে একজন রোগী প্রায় আঠারো জন নতুন রোগী তৈরি করে। অর্থাৎ চিকিৎসা না হলে, এই ভাবে যদি রোগ ছড়াতে থাকে, তা হলে তো একদিন দেশে টিবি রোগী ছাড়া আর কোনও মানুষই থাকবে না! একদিন রোগের ওষুধ যখন আবিষ্কার হয়নি, তখন তো 'যার হয় যক্ষ্মা, তার নাই রক্ষা' এই প্রবাদ বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন মারা গেছে এই রোগে। সমাজের মধ্যে আতঙ্কে ভয়ে নানা কুসংস্কার এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রতিকারের জন্য বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টারও অন্ত ছিল না। তখনও ওষুধ আবিষ্কার হয়নি, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ক্ষয় রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী চিকিৎসক ডাঃ নর্মান বেথুন। নিউমোথোরাক্সের মতো নানা জটিল অপারেশনের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে তিনি সুস্থ করে তুলেছিলেন। যদিও এই রোগ নিয়ে কাজ করতে করতেই তিনি নিজেও আক্রান্ত হন এই রোগে। নিজের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, লড়াই করার একাগ্রতায় সেই যুগেও তিনি টিবির সাথে যুদ্ধ করে, বলা যায় আশ্চর্যজনক ভাবেই সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং পৃথিবী থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করার দায়িত্ব নিলেন।

কিন্তু দেখা গেল যত জনকে তিনি সুস্থ করে তুলছেন, তাঁর কাছে আরও হাজার গুণ রোগী আসছে চিকিৎসার জন্য। তিনি কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে খুঁজে পেলেন দারিদ্রই হল এই রোগের উৎস। অর্থাৎ যে সব মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে থাকে, ঘিঞ্জি বস্তিতে অপুষ্ট যে সব মানুষ একসাথে অনেকে ঠাসাঠাসি করে বসবাস করে, তারাই এই রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে সে কথা প্রমাণিত সত্য। সাম্প্রতিক টিবি রোগের রিপোর্ট দেখলে সে কথাই প্রমাণিত হয়। ২০২৪ সালে টিবি রোগীর সংখ্যা প্রায় আটাশ লক্ষ। এর মধ্যে অপুষ্ট রোগীর সংখ্যা আট লক্ষের উপরে। এবং বেশিরভাগ রোগীরই অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। এর উপরে জুটেছে আরেক উপদ্রব। এইচ আই ভি পজিটিভ রোগী। প্রায় এক লক্ষ রোগীই হল এইচ আই ভি সংক্রমিত। এক লক্ষের উপরে টিবি রোগী ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। যাদের দেহে খুব সহজেই ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি তৈরি হয়। বর্তমানে অনিয়মিত ওষুধ সেবনের ফলে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি, এমনকি এক্স ডি আরের মতো প্রায় চিকিৎসাহীন টিবি তৈরি হয়। বর্তমানে দেশে ৬৩৮০১ জন ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি রোগী রয়েছেন। যাদের মধ্যে মৃত্যুহার প্রায় একশ শতাংশই। এই সব রোগীর থেকে যারা সংক্রমিত হন, তাদেরও মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবিই হয়। বিষয়টি কতটা ভয়াবহ, সহজেই অনুমেয়।

৬০-এর দশকের শেষের দিক থেকে টিবির ওষুধ হিসেবে রিফামপিসিনের ব্যবহার শুরু হলেও, তখন এই চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়ভার সরকার নিত না। অনিয়মিত এবং পরীক্ষামূলক বিভিন্ন কম্বিনেশন ব্যবহারের ফলে এই ওষুধের বিরুদ্ধে বহু ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স তৈরি হতে শুরু করে। ১৯৯৭ সাল থেকে টিবি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশে চালু হয়, আরএনটিসিপি অর্থাৎ রিভাইসড ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। শুরু হয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত পুরোপুরি সরকারি উদ্যোগে ওষুধ সরবরাহের প্রক্রিয়া। মানুষকে তখন স্বাস্থ্য কর্মীদের উপস্থিতিতেই ওষুধ খাওয়ানো হতে থাকে। এই প্রোগ্রাম চলে ২০২০ সাল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে টিবির ওষুধ সম্পূর্ণরূপে সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। খোলা বাজারে এই ওষুধ প্রায় অমিল হয়ে পড়ে। যদিও এই প্রোগ্রামেরও কিছু কুফল দেখা দেয়, যেমন একদিন বাদে একদিন ওষুধ সেবনের ফলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়। ফলে ২০২০ সালে ঘোষিত হয় এনটিইপি অর্থাৎ ন্যাশনাল টিবি এলিমিনেশন প্রোগ্রাম। শুরু হয় প্রতিদিন ওষুধ সেবনের প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামের রাশ থাকে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। সারা বিশ্ব যখন ২০৩০ সালের মধ্যে টিবি মুক্ত বিশ্বের আহ্বান জানায় মোদিজি একধাপ এগিয়ে ভোটের চমক দিতে ঘোষণা করে ২০২৫ এর মধ্যে টিবি মুক্ত ভারতের।

আর আজ সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ঘুরে ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মার্চ মাসেই মোদি সরকার ঘোষণা করেছে এখন থেকে আর কোনও টিবির ওষুধ সরবরাহ করা হবে না। তা হলে কি বর্তমানে ভারত টিবি মুক্ত হয়ে গেছে? তথ্য কী বলছে? না আজও ভারতেই পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ টিবি রোগী রয়েছে। এক লক্ষের কাছাকাছি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি। প্রতিদিন গড়ে মারা যাচ্ছে ১৪০০ টিবি রোগী। সাধারণ টিবিতে এখনও মারা যাচ্ছে ১২ শতাংশের উপর মানুষ। যেখানে বিশ্বে উক্ত রোগে গড়ে ৫.৮ শতাংশ মানুষ মারা যায়। তা হলে কেন এ ভাবে আগাম কোনও নোটিস না দিয়ে এবং বিকল্প কোনও পরিকল্পনা না করেই এভাবে ওষুধ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হল। যখন কোম্পানিগুলি আর টিবির ওষুধ তৈরি করছে না। বাজারেও অমিল। তখন ভিক্ষার মতো কিছু টাকা ছুঁড়ে দিয়ে কি দায় এড়ানো যায়! এই পরিস্থিতিতে যাদের হাতে টাকা আছে, তারাও তো ওষুধ কিনতে পারছে না। সেখানে যৎসামান্য টাকা দিয়ে মানুষ ওষুধ জোগাড় করবে কোথা থেকে? আর অনিয়মিত ওষুধ খেলে যে রেজিস্ট্যান্স টিবি তৈরি হয় সে কথা কি স্বাস্থ্য দপ্তর জানে না?

আজ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর কখনও বলছে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আসছে না তাই ওষুধ তৈরি হচ্ছে না। তা হলে দেশীয় কোম্পানিগুলি, যেখান থেকে টিবির ওষুধের কাঁচামাল তৈরি হত এবং কিছু পরিমাণ ওষুধও তৈরি হত, সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল কেন? কেন আজ সমগ্র ওষুধের বাজার বেসরকারি করা হল? যখন ওষুধ কোম্পানিগুলিই নির্ধারণ করছে ওষুধের দাম কী হবে এবং কোন কোন ওষুধ তারা তৈরি করবে। একদিন, বিশেষত ৯০-এর দশক পর্যন্ত তো এই নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতেই ছিল। তা হলে আজ কেন তা নেই? ওষুধ কি কেবল উচ্চ মুনাফারই সামগ্রী? যাকে কেন্দ্র করে হাজার শতাংশের বেশি মুনাফা ঢুকবে কোম্পানির ঘরে। আর নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা ঢুকবে ভোটসর্বস্ব শাসক রাজনৈতিক দলগুলোর ঘরে? এই অসাধু চক্রের কারসাজিতেই সমাজে আজ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবিতে ছেয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ। আর মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে।

২০২২-এর পর থেকে যত টিবি রোগী বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসা করান, তা মোট রোগীর এক তৃতীয়াংশেরও বেশি এবং সেই সংখ্যাটা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। ওষুধ সরবরাহের দায়িত্বও বিভিন্ন রাজ্যে এনজিওগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ভাবে চলতে থাকলে সমগ্র কর্মপ্রকল্পই তো বেসরকারি হাতে চলে যাবে! সাধারণ মানুষ পারবে তো খরচ বহন করে নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে?

সরকার এবং মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা তৈরির উদগ্র বাসনা সমাজকে আজ কোথায় ঠেলে দিচ্ছে। যেখানে টাকা আর শুধু টাকা। ভোটের এত ঢক্কানিনাদের মধ্যে ভোটসর্বস্ব দলগুলোর ভোট প্রচারে আজ এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা ঠাঁই পায়নি। অথচ এই মানুষগুলোর ভোটেই তো এরা কেউ না কেউ জয়ী হয়ে ক্ষমতায় বসে। ভেবে দেখুন, সরকার এ ভাবে মাঝরাস্তায় হাত গুটিয়ে নিলে অচিরেই তো সমাজ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবিতে ছেয়ে যাবে। মহামারী সৃষ্টি হবে। একে কি জনগণের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত যুদ্ধ বললে কিছু অত্যুক্তি হবে? যে যুদ্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলমান যুদ্ধের থেকেও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নেবে। একদিন ডাঃ নর্মান বেথুন সারা বিশ্বের অত্যাচারী অর্থলোলুপ মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, 'হত্যা ও ব্যাভিচারে ভরা এই পৃথিবীতে প্রতিবাদহীন কণ্ঠে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।' স্বাস্থ্য নিয়ে আজ সবাই মিলে প্রতিবাদ করার সময় উপস্থিত।

প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলি হানাদারির বিরুদ্ধে
ছাত্র-আন্দোলন দুনিয়া জুড়ে

‘ছাত্র হিসাবে ইতিহাসের ক্লাসে ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে আমাদের পড়ানো হয়েছে। আজ যদি আমরা চুপ করে থাকি তবে সেটা হবে শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রতি চূড়ান্ত প্রতারণা।’ মন্তব্যটা নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলি হানাদারির বিরুদ্ধে আমেরিকা জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গে এ কথা বলেন তিনি।

প্যালেস্টাইনের আক্রান্ত জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্ত ফ্রন্ট ‘আইকর’ (ইন্টারন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন অফ রেভোলিউশনারি পার্টিস অ্যান্ড অরগানাইজেশনস)— যার অফিসিয়াল সদস্য এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট), ১৫ মে বিশ্ব জুড়ে ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ দিবসের ডাক দেয়। এ দিন ভারতের বিভিন্ন শহরে ইজরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ হয়। ছবি ঃ অনন্তপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ

গত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে চলা প্যালেস্তাইনের উপর ইজরায়েলের সাম্প্রতিকতম যুদ্ধের পরিণতিতে সেখানকার ৮০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা ধ্বংস হয়েছে বলে রাষ্ট্রসংঘের একটি বিশেষজ্ঞ দল জানিয়েছে। এই হানাদারিতে এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র, ২৬১ জন শিক্ষক এবং ৯৫ জন বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপক নিহত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞ দল ১৮ এপ্রিল একটি বিবৃতিতে বলেছে, এটা ইচ্ছাকৃতভাবে প্যালেস্তাইনের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা বা ‘বুদ্ধিজীবী গণহত্যা’ বা ‘স্কলাশটিসাইড-এর সামিল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই আক্রমণ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্যালেস্তিনীয় সমাজের ভিত্তিকে ধ্বংস করার জন্যই ছক বেঁধে এবারের আক্রমণ সংগঠিত করা হয়েছে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র ‘এটা’-র মতে, (সম্পূর্ণ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে প্যালেস্তাইনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে স্বীকার করছে না, সেটাই ভয়ঙ্কর। ‘দ্য নিউ স্কুল’-এর একজন ছাত্রী ‘রু’ (সম্পূর্ণ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেছে, আমি মনে করি এই গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এবং এর অবসানের জন্য সংগ্রামে নিজের যথাসাধ্য করার জন্য প্রত্যেকের নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

আমেরিকা এবং ন্যাটো-গোষ্ঠীভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি শুরু থেকেই ইজরায়েলের বন্ধু। এবারেও তারা ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় জো বাইডেনের ‘ডেমোক্রেটিক’ দলের সরকার ইজরায়েলকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে গণহত্যায় সাহায্য করছে। এই মানবতাবিরোধী নীতিকে সমর্থন করতে পারেনি আমেরিকার ছাত্রসমাজ। তারা এর তীব্র বিরোধিতা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান শুরু করে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। তারা ইজরায়েলের ভয়ঙ্কর হামলার তীব্র বিরোধিতা করে এবং ইজরায়েলের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দাবি জানায়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে হার্ভার্ড, ইয়েল, স্ট্যানফোর্ড, এমআইটি, ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস সহ আরও বহু কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমেরিকার সংবাদসংস্থা ‘অ্যাক্সিয়স’-এর সূত্রে জানা গেছে দেশের ১৩০টি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আন্দোলন চলছে। সভা চলছে, অবস্থান-ধর্না হচ্ছে। এই আন্দোলন দমন করতে মার্কিন প্রশাসন তাদের স্বৈরাচারী নীতি অনুসরণ করে দমন-পীড়ন নামিয়ে এনেছে। প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তার করছে, বর্বর পুলিশি হামলা চালাচ্ছে। একটি ভিডিও ক্লিপিংয়ে দেখা যাচ্ছে এক মহিলা বিক্ষোভকারীকে মাটিতে ফেলে হাত পিছমোড়া করে বাঁধা হচ্ছে। ‘অ্যাক্সিয়স’-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের ৬১টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে ২৯০০ জন ছাত্রছাত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয় কানাডা,মেক্সিকোতেও গণহত্যাবিরোধী এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। কানাডার কুইবেক-এর ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক ডজন বিক্ষোভকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং পুলিশের হুমকি উপেক্ষা করে তাদের অবস্থান-ধর্না চালিয়ে যেতে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়। কিন্তু আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থন দেখে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অস্বীকার করে। ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয়, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। মেক্সিকোর সব থেকে বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ‘অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি অফ মেক্সিকো’তে (ইউএনএএম) ছাত্রছাত্রীরা ইজরায়েলের সঙ্গে মেক্সিকোর সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবিতে শিবির তৈরি করে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইজরায়েলের হানাদারিতে এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র, ২৬১ জন শিক্ষক এবং ৯৫ জন বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপক নিহত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞ দল ১৮ এপ্রিল একটি বিবৃতিতে বলেছে, এটা ইচ্ছাকৃতভাবে প্যালেস্তাইনের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা বা ‘বুদ্ধিজীবী গণহত্যা’ বা ‘স্কলাশটিসাইড’-এর সামিল।

আটলান্টিকের পূর্ব পারে ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটেনের দুটি ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজেও তীব্র ছাত্র-আন্দোলন চলছে। ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনেও বিক্ষোভ হয়েছে, নিউক্যাসল, ব্রিস্টল, ওয়ারউইক, লিডস, শেফিল্ড এবং শেফিল্ড হ্যালাম সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও বিক্ষোভ হয়েছে। লন্ডনের গোল্ডস্মিথস ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের দাবিগুলি সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে ট্রিনিটি কলেজে ছাত্ররা প্যালেস্টাইনের পতাকা এবং ব্যানার দিয়ে সজ্জিত তাঁবু স্থাপন করেছে। সেই ব্যানারে লেখা আছে ঃ ‘ইজরায়েল একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র’, ‘গণহত্যা বন্ধ করো’। বিশ্ব জুড়ে ওঠা সেই বিখ্যাত স্লোগান লিখেছে তারা— ‘ফ্রম রিভার টু সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি’।

ফ্রান্সে ‘প্যারিস ইনস্টিটিউট অফ পলিটিক্যাল স্ট্যাডিজ’ (সায়েন্স পিও)-এ অনশনে বসেছে ছাত্ররা। প্যারিসের সর্বোন ইউনিভার্সিটির প্রতিবাদকারীরাও অতি সম্প্রতি নৃশংস পুলিশি আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। দেশের সর্বত্র এর ব্যাপক নিন্দা হচ্ছে। ফ্রান্সের উচ্চ-বিদ্যালয়গুলির ছাত্ররাও হাজারে হাজারে বিক্ষোভ করেছে। তারা অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছে।

জার্মানির বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, লিপজিগ, ব্রেমেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন এবং তার উপর বর্বর পুলিশি হামলা প্রত্যক্ষ করেছে। দেশের ১০০টিরও বেশি অ্যাকাডেমিতে পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালায়। লক্ষ্য একটাই— ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন করা যাবে না।

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপের আরও নানা দেশে। নেদারল্যান্ডস, ইতালি, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ডে বিক্ষোভ হয়েছে। একই রকম ছাত্র বিক্ষোভের সাক্ষী থেকেছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড।

জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্যালেস্তাইনের স্বাধীনতার দাবিতে মুখরিত হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সুবাক’ নামক প্যালেস্তাইন-সংহতি সংঘ বিক্ষোভ দেখায়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের সামনে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ দেখিয়েছে। উত্তর আফ্রিকার দেশ মিশরের কায়রোয় আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে এবং বেইরুটের লেবানিজ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-বিক্ষোভ হয়েছে এবং চলছে।

সাম্প্রতিক কালের এই ছাত্র-আন্দোলনকে এই শতাব্দীর বৃহত্তম ছাত্র-আন্দোলন বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এই আন্দোলন জোর গলায় ঘোষণা করছে— সাম্রাজ্যবাদীরা নয়, শেষ কথা বলবে যুদ্ধবিরোধী প্রতিরোধের শক্তি-ই।

গাজার গণহত্যায় ইন্ধন জোগাতেই কি ইজরায়েলে অস্ত্র পাঠাচ্ছে ভারত

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ মে এক বিবৃতিতে বলেন, ভারত থেকে ইজরায়েলে ২৬.৮ টন অস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ে যাওয়ার পথে ডেনমার্কের পতাকাবাহী জাহাজকে নোঙর করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে স্পেনের বিদেশ মন্ত্রক। ১৭ মে সংবাদমাধ্যমে তা প্রচারিত হয়েছে। এই জাহাজে রকেট ইঞ্জিন, বিস্ফোরক সহ রকেট, অন্যান্য বিস্ফোরক ও বিস্ফোরকের চার্জ বিপুল পরিমাণে বহন করা হচ্ছে। পুণের একটি ভারতীয় কোম্পানি থেকে এই অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

এর আগেও গাজায় ইজরায়েলের হানা শুরু হওয়ার পর দু’বার ২০২৩-এর ২০ নভেম্বর এবং ২০২৪-এর ১২ জানুয়ারি ‘প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভস লিমিটেড’ নামে ভারতীয় বেসরকারি একটি কোম্পানিকে ইজরায়েলে বিস্ফোরক ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ পাঠানোর ছাড়পত্র দিয়েছে ভারত সরকার। এ থেকে স্পষ্ট, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে পরিষ্কার বোঝাপড়া করেই ভারত সরকার গাজার গণহত্যায় ইন্ধন জোগাচ্ছে। এ জন্যই ইজরায়েলে যুদ্ধ উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে তারা। ভারত সরকারের এই ভূমিকা আগেই স্পষ্ট হয়েছিল, যখন গত মাসে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ইজরায়েলে অস্ত্র পাঠানোর উপর নিষেধাজ্ঞা এবং গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি সংক্রান্ত প্রস্তাবে ভোট দানে তারা বিরত থাকে। ভারত সরকারের এই ভূমিকার আমরা তীব্র নিন্দা করছি। ভারত সরকার যে মানবতা ও সভ্যতার সমস্ত রীতিনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে গাজার গণহত্যায় মদত জোগাচ্ছে এই ঘটনায় তা আবার সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হল।

আমরা ভারতের জনগণ গাজার মানুষের পাশে আছি। আমরা ভারত সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, ইজরায়েলে অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাঠানো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 41 Bengali Weekly May 31, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মবার্ষিকী পালিত

২২ মে ভারতবর্ষের নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের ২৫২তম জন্মদিবস পালিত হল নানা স্থানে। বাংলা তথা ভারতের সমাজ যখন অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেই সময় সকল প্রতিবন্ধকতাকে চূর্ণ করে রামমোহন রায় এগিয়ে এসেছিলেন সেই অন্ধকার দূর করতে। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই চিরস্মরণীয়। তাঁর পাণ্ডিত্য ও দৃঢ়তা বহু বিশিষ্ট জনকে আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর পথ ধরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব।

রামমোহন রায়ের জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য হুগলিতে 'রাজা রামমোহন রায় সার্ধ দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী পালন কমিটি' গত তিন বছর ধরে নানা কর্মসূচি পালন করে চলেছে। এ বছরেও তাঁর জন্মদিনে শ্রীরামপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে রাজা রামমোহন রায়ের বসতবাড়ি রঘুনাথপুর পর্যন্ত সুসজ্জিত পদযাত্রা হয়। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন বহু মানুষ। সেখান থেকে তাঁর জন্মস্থান রাধানগরে মিছিল করে গিয়ে নানা অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। পরিচালনা করেন কমিটির সদস্য রীতা মাইতি।

রেমাল দুর্গতদের পাশে এসইউসিআই(সি)

একের পাতার পর

হয়েছে ব্যাপক। বহু দুর্বল ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় জনসাধারণ বৃষ্টির মধ্যেই নদীবাঁধ রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। যেসব জায়গায় কিছু মানুষকে নিরাপত্তার জন্য এনে রাখা হয়েছে সেখানে খাদ্য-পানীয়-জলের ব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল। জয়নগর এবং কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর ও জয়কৃষ্ণ হালদার ত্রাণশিবিরগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য, পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন। দলের পক্ষ থেকে বিডিও, এসডিও এবং সেচের নানা দপ্তরে বারবার জানানো সত্ত্বেও দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এলাকাগুলোতে বেশকিছু দুর্বল ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে, সর্বত্রই গাছ ভেঙে পড়েছে, পান বরোজের ও সবজি চাষেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মৎস্যজীবীদের নৌকাও বহু জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া কিছু পুকুর ডুবে মাছচাষের ক্ষতি হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে কৃষক সহ সকল ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় পুরোপুরি বিপর্যস্ত। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য পানীয় জলের সংকটও ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। উল্লেখিত এলাকাগুলিতে বিডিও, এসডিও এবং সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরে ইতিমধ্যে দলের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে জেলাশাসকের কাছে দলের পক্ষ থেকে ঝড় আসার আগেই দাবি জানানো হয় কাঁথি, এগরা, নন্দীগ্রাম, রামনগর, খেজুরি এলাকার সমুদ্র ও নদীতীরবর্তী স্থানগুলি থেকে মানুষজনকে সরাতে হবে।

মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড বিশ্বনাথ সরদার পাথরপ্রতিমা ব্লকের হেরম্ব গোপালপুর, রায়দিঘি ব্লকের নগেন্দ্রপুর প্রভৃতি এলাকা জলমগ্ন হওয়ার খবর পেয়ে এলাকায় যান। দুর্গত মানুষদের সাথে কথা বলেন। স্থানীয় কর্মীরা জলমগ্ন মানুষকে উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ শুরু করেন। প্রশাসনের কাছে প্রার্থী দাবি জানান, পর্যাপ্ত ত্রাণ দিতে হবে এবং অতি দ্রুত নদী বাঁধ সংস্কার করতে হবে।

জয়নগর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড নিরঞ্জন নস্কর গোসাবা এবং কুলতলীর নদীবাঁধ এলাকাগুলির খোঁজখবর নেন। তিনি জানান, বাঁধগুলি খুবই জীর্ণ দশা, জোয়ারের জলে যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। প্রশাসনকে সতর্ক থাকা এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণের ব্যবস্থা করার দাবি জানান তিনি।

ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের সাতগাছিয়া, বাওয়ালি, বজবজ এলাকায় বহু গাছ পড়ে গেছে, বিস্তীর্ণ অংশ বিদ্যুৎহীন। দলের প্রার্থী কমরেড রামকুমার মণ্ডল এলাকার মানুষের খোঁজখবর নেন। দলের কর্মীরা বিপর্যস্ত মানুষদের সাহায্যের জন্য উদ্যোগ নেন। প্রার্থী এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান প্রশাসনের কাছে।

উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই ২৭ মে বিকেলে কলেজ স্ট্রিট বাটা, মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, তারক প্রামাণিক রোড, রাজা রামমোহন সরণি প্রভৃতি জলমগ্ন এলাকায় পৌঁছে দুর্গত মানুষদের সাথে কথা বলেন এবং জমা জল দ্রুত অপসারণ, এলাকাবাসীদের প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান।

কেশব সেন স্ট্রিটের জলমগ্ন এলাকায় স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলছেন উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র। ২৭ মে

দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড জুবের রব্বানি পার্ক সার্কাস এলাকার দিলখুশা স্ট্রিট, কড়েয়া থানার সামনে লোয়ার রেঞ্জ এলাকা, ৬৯ নং ওয়ার্ডের রোনাল্ড রোড প্রভৃতি জলমগ্ন এলাকাগুলিতে গিয়ে বিপর্যস্ত মানুষদের সাথে কথা বলেন এবং প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

যাদবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড কল্পনা নস্কর দত্ত এলাকার জলমগ্ন এলাকাগুলিতে যান এবং দুর্গত মানুষদের সাথে দেখা করেন ও নিচু এলাকাগুলি থেকে দ্রুত জল বের করে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান।

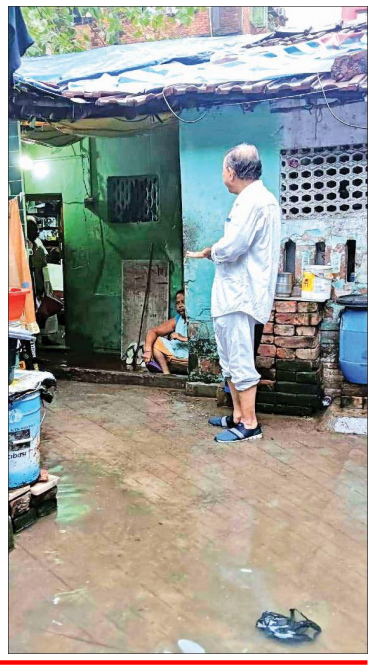

দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড জুবের রব্বানি ৬৯ নং ওয়ার্ডের রোনাল্ড রোডে দুর্গত মানুষের পাশে। ২৭ মে

বিকাশের ঠেলায় নাভিশ্বাস

'দেশ এগোচ্ছে' বলে প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতারা এবং তাঁদের অনুগত সংবাদমাধ্যম যে ক্রমাগত বলে চলেছে, তাতে যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁদের জন্য মোক্ষম প্রমাণ তুলে ধরেছে উপদেষ্টা সংস্থা নাইট ফ্রাঙ্ক। সংস্থাটি তাদের সমীক্ষার রিপোর্টে বলেছে, ভারতে অতি ধনী মানুষের (যাদের মোট সম্পদ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা) সংখ্যা ২০২২-এর তুলনায় গত বছরে ৬ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৩,২৬৩ জন। সংস্থাটি সমীক্ষার ফল উদ্ধৃত করে দাবি করেছে, পাঁচ বছরে (২০২৩-২০২৮) ভারতে সংখ্যাটা ৫০ শতাংশ বেড়ে হতে পারে ১৯,৯০৮ জন। এর পরও যদি কেউ বিজেপির উন্নয়ন তত্ত্বে বিশ্বাস না রাখেন তবে তিনি নির্ঘাত দেশদ্রোহী!

আর যদি কেউ এর পরও বলেন যে, না, এই উন্নয়ন শুধুমাত্র দেশের মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ধনকুবেরের, দেশের ৯৯ ভাগ সাধারণ মানুষের নয় এবং তার প্রমাণ হিসাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য দপ্তরের তথ্য দেখিয়ে বলেন, যে, আন্তর্জাতিক ক্ষুধা সূচকে ২০১৪ সালে ভারতের অবস্থান যেখানে ছিল ৫৫, সেখানে ২০২৩ সালে ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারত ১১১তম স্থান পেল কেন, তবে তার নামে একটা ইউএপিএ দেওয়াই যায়! আর মাথাপিছু আয়ের নিরিখে ২০২৩ সালে বিশ্বের ১৫৫টি দেশের মধ্যে ভারত ১৪৩তম স্থানে— এই তথ্য দেখিয়ে কেউ যদি বলেন, এই তথ্যই প্রমাণ করে, প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের এই দাবি মিথ্যা, তবে তিনি যে বিজেপি সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট তা নিয়ে নিশ্চয় কোনও সন্দেহ থাকে না! কিংবা কেউ যদি এনসিআরবি রিপোর্ট তুলে ধরে প্রশ্ন করে যে, এতই যদি উন্নয়ন তবে মোদি সরকারের আমলে (২০১৪ থেকে '২২) ১,০০,৪৭৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করল কেন? কেন প্রতি দিন গড়ে ৩০ জন কৃষক ও দিনমজুর আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন প্রধানত ঋণের ভারের জন্য? বিজেপি নেতারা কি তাঁদেরই পুলিশ-প্রশাসনের বানানো এনসিআরবি রিপোর্টটিকে বলবেন যে, ঠিক নয়!

অক্সফ্যাম রিপোর্টের কথাই ধরা যাক। এটি পুঁজিপতিদেরই একটি সংস্থা। অক্সফ্যামের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে— মাত্র ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে রয়েছে ভারতের ৪০ শতাংশের বেশি সম্পদ, আর নীচের ৫০ শতাংশের হাতে রয়েছে মাত্র ১ শতাংশ সম্পদ। প্রধানমন্ত্রী কি বলবেন এই রিপোর্ট ভারতের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ? বিশ্বাস নেই, বলতেও পারেন!

আসলে প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতাদের কাছে দেশ মানে দেশের জনগণ নয়। তাঁরা দেশ বলতে বোঝেন দেশের মুষ্টিমেয় ধনকুবেরকেই। তাই তাদের উন্নয়নটাকেই এই নেতারা দেশের উন্নয়ন বলে দেখাতে চান। কিন্তু যে শিক্ষিত বেকার যুবক দোকান থেকে খাবার সংগ্রহ করে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে কোনও রকমে সংসারটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন, কিংবা সেই কৃষক পরিবারটি যার একমাত্র রোজগেরে মানুষটি ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, কিংবা সেই পরিবারটি যারা পরিবারের চিকিৎসার খরচ জোগাতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছে, প্রধানমন্ত্রী কিংবা তাঁর দল তাদের কোনও ভাবেই এই উন্নয়নের গল্প বিশ্বাস করাতে পারবেন কি?

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com